চরণদাস এম. এল. এ.—সতীনাথ ভাদুড়ী

(১৯০৬-১৯৬৫)

মা-বাপের কাছ থেকে পাওয়া নাম চরণদাস। একসময় লোকে ভালোবেসে ডাকত চরণদাসজী বলে। পরিস্থিতি বদলেছে। আজকাল সরকারি দপ্তর তার নাম শ্রীচরণ দাস, এম-এল-এ। সাধারণ লোকের মধ্যে যারা নিজেদের ইংরেজি জানা ভাবে, তারা আজকাল ডাকে ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব বলে; আর যাদের ইংরেজি জানবার কোনরকম দাবি নেই তারা ডাকে মায়লে-জী বলে। এই উচ্চারণ-বিকৃতি কোনরকম দুরভিসন্ধিজাত নয়।

সেই মায়লেজী এসেছেন তাঁর পুরোনো অফিসে। পার্টি অফিস। তাঁর সেকালকার কর্মকেন্দ্র। বছর চারেক পরে এই এলেন স্টেশন থেকে, রিক্‌শাতে করে!

ফ্যাসাদ! লটারির টিকিট না কিনলে লটারিতে টাকা পাবার উপায় নেই, ভোটে না দাঁড়ালে এম-এল-এ হবার উপায় নেই!

আর এম-এল-এ না হতে পারলে? সে কথা বলে কাজ কী!

যখন পৌঁছলেন তখন সবে ভোর হয়েছে।

'নমস্তে লখনলালজী!'

'আরে! ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব যে! নমস্তে!'

'সব ভাল তো?'

'হাঁ। আপনার কুশল বলুন! একেবারে কোন খবর না দিয়ে যে!'

'এই এলাম আপনাদের সঙ্গে দেখাশোনা করতে।'

'তা বেশ করেছেন। আসাই তো উচিত। 'হায়-কমান্ড' হুড়ো দিয়েছে বুঝি?'

এম-এল-এ সাহেব এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। লখনলাল ধরেছে ঠিকই। 'হাইকম্যান্ড' নামের এক খামখেয়ালী, সর্বপ্রতাপশালী ভগবানকে তিনি ভয় করেন। সেই 'হাইকম্যান্ড' নাকি বলেছেন যে আসল ভগবান হচ্ছেন ভোটার। নারায়ণের চেয়েও বড়, নরনারায়ণ। ভোটারদের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক কম তাঁকে নাকি আসছে বার আর এম-এল-এ করা হবে না। শুনেই ছুটে এসেছেন তিনি নকল ভগবান ছেড়ে আসল ভগবানের শরণে। লখনলাল একসময় ছিল তাঁর শাগরেদ; এখন প্রতি মাসে তাঁর কাছ থেকে পঞ্চাশটা করে টাকা নেয় এবং প্রতিদিন তাঁর ইয়েমিয়েলিয়েগিরি ঘোচাবার হুমকি দেখায়। তাঁর অপরাধ তিনি দশ-বারো বছর থেকে সপরিবারে রাজধানীতে থাকেন; এখানে আসেন কম। এখানকার যেসব কর্মীদের তিনি একসময় নিজ হাতে গড়েপিঠে মানুষ করে তুলেছিলেন, তাদের সবগুলোর আজ পাখা গজিয়েছে। সবগুলোর ওই একই ধুয়ো—তিনি নাকি এম-এল-এ হবার পর থেকে এখানকার ভোটারদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না।

এরা সবাই মাসে বিশদিন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে রাজধানীতে 'এম-এল-এ কোয়ার্টার্স'-এ তাঁর অন্ন ধ্বংস করে, হাইকোর্টে নিজেদের মোকদ্দমা তদ্বির করে, আর সরকারি দপ্তর থেকে নানারকম অন্যান্য সুবিধে পাইয়ে দেবার জন্যে তাঁকে জ্বালিয়ে মারে। এর পরিবর্তে পান থেকে চুন খসলে শাসানি তাঁর প্রাপ্য! তাদের মন জুগিয়ে চলতে হয় তাঁকে অষ্টপ্রহর! ঘেন্না ধরে গেল একেবারে! কিন্তু উপায় কী!

এরই নাম পরিস্থিতি। তাঁদের অভিধানের সবচেয়ে বহুল-ব্যবহৃত শব্দ। মত বদলাবার অজুহাত হিসেবে কাজে লাগে কিনা কথাটা।

ঝোলা আর কম্বলটা রিক্‌শা থেকে নামিয়ে, রিক্‌শাওয়ালাকে আট আনা পয়সা দিতেই সে 'জয় গুরু' বলে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাল। লখনলালজী হাসছেন।

'আর চার আনা পয়সা দিয়ে দেন ওকে ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব। আজকাল বারো আনা করে রেট হয়ে গিয়েছে। আপনি সেই চার বছর আগেকার রেট্‌ই জানেন কিনা।'

অপ্রস্তুত হয়ে এম-এল-এ সাহেব আর চার আনা পয়সা বার করে দিলেন। পয়সা নিয়ে রিক্‌শাওয়ালা 'জয় গুরু' বলে চলে গেল।

লখনলাল তাঁর ঝোলা আর কম্বল তুলে নিয়ে ঘরে রাখতে যাচ্ছিল।

'আহা করেন কী লখনলালজী! ভারী তো জিনিস।'

এম-এল-এ সাহেব তার হাত থেকে নিজের জিনিসগুলো কেড়ে নিয়ে, ঘরের মধ্যে রাখলেন।

'জন-সম্পর্ক বাড়াবার প্রোগ্রামে আসবার সময় হোল্‌ড-অল্‌ আর স্যুটকেস না এনে ঠিকই করেছেন ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব।'

তার চোখে দুষ্টুমির হাসি। যে বোঝে সব। সাধে কি আর তাকে মাসে পঞ্চাশটা করে টাকা দিতে হয়।

'যে কাজে এসেছি সে কাজের দিক দিয়ে দেখতে গেলে লোকজনের সম্মুখে আমাকে বারবার এম-এল-এ সাহেব বলে না ডাকাই ভাল, তাই না? আপনাদের কাছে তো আমি সেই পুরোনো চরণ দাসই আছি এখনও।'

'শুধু চরণ দাস নয়। আপনি এখন এসেছেন ভোটারদের চরণে আশ্রয় নেবার জন্যে। আপনার নাম এখন হওয়া উচিত ভোটার-চরণ-দাস। বোলো একবার ভোটার-চরণ দাসজীকী জয়!'

চিৎকারে আর উচ্চহাসিতে ঘরের সকলের ঘুম ভাঙল। কে একজন যেন 'জয় গুরু' বলে চোখের পাতা খুলল। পাশের বালিশে লোকটি তার মুখ চেপে ধরেছে—'আমাদের সেক্যুলার সংবিধান'—এই কথা বলে হাসতে হাসতে।

বচ্‌কন্ মহতো লাফিয়ে উঠেছে খাটিয়া ছেড়ে।

'আরে মায়লেজী যে! নমস্তে! কখন? কবে? কোথায় উঠেছেন? সার্কিট হাউসে না ডাকবাংলায়?'

চরণ দাস ঠিক করে রেখেছেন যে এখানে কারও কথায় বিরক্তি প্রকাশ করবেন না। এদের বলার উদ্দেশ্য যে তিনি এখানে কখনও এসে ওঠেননি গত কয়েক বছরের মধ্যে। দু'বার মন্ত্রীদের সঙ্গে এসেছিলেন দু'দিনের জন্যে, তখন উঠেছিলেন সার্কিট হাউস-এ। সেই খোঁটাই বোধহয় এরা দিচ্ছে এখন।

বলল, 'এখানেই এসে উঠলাম।'

'কেন? বাড়ি ভাড়া আদায় করতে নাকি?'

খোঁচা না দিয়ে কথা বলতে জানে না এরা। তাঁর এখানকার পৈতৃক বসতবাড়িটা তিনি গবর্নমেন্টকে ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন বছর কয়েক হল। এখানকার লোকে ভাল চোখে দেখেনি জিনিসটাকে। কোন জিনিস তলিয়ে দেখে না এরা। রাজধানীতে পরিবার নিয়ে থাকেন; ছেলেমেয়েরা সেখানকার স্কুল-কলেজে ভরতি হয়েছে। যা আয় তাতে দু'জায়গায় বাড়ির খরচ চালানো শক্ত, সেইজন্যে এখানকার বাড়ি গভর্নমেন্টকে ভাড়া দিয়ে দিতে হয়েছে। এই সামান্য কথাটা বুঝবে না এরা।

'না, এমনি আপনাদের সঙ্গে দেখাশোনা করতে এলাম।'

'ক' দিনের প্রোগ্রাম মায়লেজীর?'

'দেখি তো।'

'এক আধদিনের বেশি কি আর থাকতে পারবেন এখানে!'

'কী যে বলেন!'

ব্যথা পান এম-এল-এ সাহেব। এরা ভাবে তিনি ইচ্ছে করে এখানে আসেন না। ভুল ধারণা। ইচ্ছে থাকে, কিন্তু হয়ে ওঠে না। কতবার ঠিক করেছেন আসবেন; কিন্তু একটা না একটা বাধা এসে পড়ায় হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া অন্য কথাও আছে এর মধ্যে। বারো বছর বড় শহরে থাকবার পর ছেলেমেয়েরা আর এখানে ফিরে আসতে চায় না। ছোট ছেলেটার জন্ম রাজধানীতে; এখানকার শেয়ালের ডাকে রাত্রিতে ভয় করবে, এই হচ্ছে তার মায়ের ধারণা। স্ত্রীর পুরোনো অম্বলের ব্যাধিটাও রাজধানীতে গিয়ে সেরেছে। এইসব নানা কারণে মিলিয়ে এখানে আসা হয়ে ওঠে না। সবচেয়ে তাঁর আশ্চর্য লাগে যে, সেখানকার শহুরে সমাজের বন্ধুবান্ধবরা আজও তাঁকে পাড়াগেঁয়ে ভাবে, আর এখানকার লোকে অপবাদ দেয় যে তিনি আচারে-ব্যবহারে সম্পূর্ণ শহুরে হয়ে গিয়েছেন; তাঁর দশ বছরের মেয়েটার পর্যন্ত রাজধানীতে জন্মাবার অধিকারে, বান্ধবীদের সম্মুখে বাবার গ্রাম্য আচরণে, লজ্জা লজ্জা করে।

'আচ্ছা, পরে সব কথা হবে; এখন মুখ হাত ধুয়ে নিন, মায়লেজী। দাঁতন তো আপনার দরকার নেই?'

প্রশ্নের উত্তর দিল লখনলাল—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাঁতনের দরকার বইকি। উনি মাজবার বুরুশ আনলেও এখানে ব্যবহার করবেন না। এ-যাত্রায় উনি একেবারে পুরোনো চরণদাসজী সেজেছেন। নিছক ভোটার-চরণ-দাসজী।'

বাগে পেলে, রেখে ঢেকে কথা বলতে এরা জানে না। বাধ্য হয়ে এ রসিকতায় এম-এল-এ সাহেবকেও হাসতে হয় এদের সঙ্গে সঙ্গে।

'আচ্ছা আমি আসছি একটু এদিক-ওদিক ঘুরে।'

দাঁতন নিয়ে খালি গায়ে খালি পায়ে তিনি বার হলেন অফিস থেকে।

বচ্‌কন্ মহতো রসিকতা করে—'আরম্ভ হয়ে গেল মায়লেজীর জনসম্পর্ক স্থাপনার প্রোগ্রাম।'

লখনলালজী ফোড়ন দেয়—'সে তো আগেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বোলো একবার ভোটার-চরণ-দাসজী কী জয়।'

ভোরবেলায় দাঁতন করতে করতে এম-এল-এ সাহেব পাড়ার লোকজনের সঙ্গে কিছুক্ষণ সহজভাবে মেলামেশা করে নিতে চান। ইচ্ছে করলেও কি এখানকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলা যায়। নাড়ীর টান যে। গায়ের ময়লা নয় যে ইচ্ছে হলেই ডলে ফেলে দেবে!

ও কে আসছে—সুন্‌রা না! খুব হন হন করে চলছে সে।

'নমস্তে সুন্দরলালজী।'

'জয় গুরু। আরে আপনি! আমি চিনতেই পারিনি।'

'খবর সব ভাল ত?'

'হ্যাঁ! আচ্ছা চলি। জয় গুরু!'

তেমনি হন হন করেই সুন্‌রা চলে গেল। ব্যস্ত এবং অন্যমনস্ক ভাব তার। এম-এল-এ সাহেব ভেবেছিলেন যে তার কাছ থেকে কথায় কথায় জেনে নেবেন পাড়ায় এখন কে অসুস্থ আছে। তারপর কিছু ভাল পথ্য কিনে নিয়ে অন্য সময় রুগীর বাড়িতে যাবেন। কিন্তু কথা বলবার সুযোগ পাওয়া গেল না সুন্‌রার সঙ্গে, একটু ক্ষুণ্ণ হলেন তিনি। ঠিক এরকমটা আশা করেন নি। লখনলালের দল রাজধানীতে তাঁর কাছে প্রায়ই বলত যে এখানকার পরিস্থিতি বদলেছে; রাজনীতিক মিটিং-এ লোকজন হয় না; লীডাররা গেলে তাঁদের মালার জন্য গৃহস্থবাড়ি থেকে গাঁদা ফুল পাওয়া পর্যন্ত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি এসব কথা বিশ্বাস করতেন না; ভাবতেন লখনলালরা বোধহয় তাঁকে মোচড় দিয়ে আরও কিছু বেশি টাকা আদায় করতে চায়। সুন্‌রার এখনকার হাবভাবে মনে হ'ল যে

কথাটার মধ্যে কিছু সত্য থাকতেও পারে।

একটা ছোট ছেলে ছুটছে। মনে মনে ঠিক করা ছিল যে ছোট ছেলে দেখলেই গাল টিপে আদর করবেন; আর তার চেয়ে ছোট হলে কোলে নিয়ে লজেনস্ খেতে দেবেন। পকেট ভরতি করে তিনি লজেনস্ টফি নিয়েছেন। হেসে ছেলেটাকে ডাকলেন। সে ফিরেও তাকাল না। ছুটে চলেছে রাস্তা ধরে। একটু হতাশ হলেন।

বারো বছরের অনভ্যাসে, পথের ধুলো-কাঁকরের উপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে। কাঁটার ভয়ে, ভাঙা কাঁচের টুকরোর ভয়ে, একটু সাবধান হয়ে পা টিপে টিপে হাঁটছেন। আগেকার জীবনের খালি পায়ে চলাফেরার সেই সাবলীলতা আর ফিরে আসবার নয়। 'হুক্-ওঅর্ম'-এর ভয় সেকালে কখনও হয়নি। নিজের অজ্ঞাতে কখন থেকে যেন নাকে কাপড় দিয়ে চলছিলেন। লোটা হাতে একজনকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি হাতটা নামিয়ে নিলেন। বিরসা আসছে এগিয়ে। তাঁকে চেনবার চেষ্টা করল; অন্তত চাউনি দেখে তাই মনে হয়। বিড়বিড় করে কি একটা স্তোত্র বলছে সে।

'নমস্তে বৃহস্পতিজী!'

'জয় গুরু! মায়লেজী? আমি চিনতেই পারছিলাম না। খালি গায়ে খালি পায়ে আপনাকে দেখব ভাবিনি কি না।'

'খবর ভাল ত সব?'

'হ্যাঁ! আচ্ছা এখন আসি! জয় গুরু!'

বিড়বিড় করে স্তোত্রপাঠ করতে করতে সে চলে গেল। অল্পেতে মুষড়ে পড়বার লোক তিনি নন। তবু বর্তমান পরিস্থিতির খারাপ দিকটা মনে না এনে পারলেন না। এখানকার লোকে তাঁকে চিরকাল কত ভালোবাসত। আগেকার জীবনে সেইটাই ছিল তাঁর পুঁজি। পরের জীবনটুকু ভেবেছিলেন সেই পুঁজি ভাঙিয়েই কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু তা আর বোধহয় তাঁর কপালে নেই! সন্দেহ হল, লখনলালজীরাই তাঁর বিরুদ্ধে কিছু মিথ্যে প্রচার করেনি তো, এখানকার লোকজনের মধ্যে? কিছু বলা যায় না। তার নিজেরই ইচ্ছে থাকতে পারে এই নির্বাচনক্ষেত্র থেকে এম-এল-এ-র জন্যে দাঁড়াবার! হাইকম্যান্ডের কাছেও চুপি চুপি তাঁর বিরুদ্ধে লাগায়নি তো কিছু? ভগবান জানেন!

একজন বর্ষীয়সী মহিলা হাতে একটা পাতার ঠোঙায় কি যেন নিয়ে ধানের ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে চলেছেন যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে।

চরণদাসজী চশমাটা খুলে রেখে এসেছেন; তাই দুরের জিনিস দেখতে একটু অসুবিধে হচ্ছে। তিরথার মা বলেই মনে হচ্ছে যেন ওঁকে। হ্যাঁ ঠিকই তাই।

'ও চাচী! কোথায় এই সকালে এত তাড়াতাড়ি?'

বৃদ্ধাটি মাথার কাপড় টেনে দিয়ে আরও তাড়াতাড়ি হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

'ও চাচী! তীর্থানন্দের খবর ভাল তো? নাতিপুতিরা সব ভাল তো? চিনতে পারছেন না? আমি চরণা।'

কী বুঝলেন, না বুঝলেন তিনি জানেন। দেখা গেল তাঁর গতি দ্রুততর হয়েছে। পাটের ক্ষেতের পাশ দিয়ে বেরিয়ে ফুলের সাজি হাতে করে একটি মহিলা 'জয় গুরু' বলে তাঁকে অভিবাদন করায় তিনিও 'জয় গুরু' বলে মুহূর্তের জন্যে দাঁড়ালেন। কী যেন কথা হ'ল। দু'জনেই একবার চরণদাসজীর দিকে তাকালেন। তারপর দু'জনেই একই পথে এগিয়ে গেলেন।

এতক্ষণে সত্যই চিন্তান্বিত হলেন এম-এল-এ সাহেব। জনসম্পর্ক স্থাপনার কাজটা যত সহজ ভেবেছিলেন, তত সহজ নয়।

লাঠিতে ভর দিয়ে চথুরি চলেছে। সে এমনিতেই একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক চিরকাল। একটু ইতস্ততঃ করে তাকে ডাকলেন তিনি। ছেলেবেলায় লোকটা তাঁদের বাড়ির মোষ চরাত। সে দাঁড়াল—একটু অবাক হয়ে।

'জয় গুরু! ও আপনি! চিনতে পারিনি। রাজধানীর জল দেখছি খুব ভাল। গুরুদেবের কৃপায় আপনার গায়ে বেশ মাংস লেগেছে। লাগবারই তো কথা। ভোরে উঠে দাঁতন করতে করতে খালি পায়ে বেড়াবার পুরোনো অভ্যেস এখনও আপনি রেখেছেন দেখছি। সেও ভাল।'

'আরে চথুরি, মানুষ কি আর বদলায়। যে যেমন ছিল তেমনি থাকে।'

'এ কী কথা বলছেন আপনি মায়লেজী। মানুষ বদলায় না? কত রত্নাকর ডাকাত বদলে মুনি-ঋষি হয়ে গেল। তবে হ্যাঁ, সেই রকম গুরুর মতো গুরুর কৃপা চাই। এ কথা আমার গুরুদেবের মুখে কতদিন শুনেছি। আমাদের গুরুদেব তো মানুষ নন—তিনি দেবতা—ঠাকুর— ভগবান! জয় গুরু!'

লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে সে চলে গেল, তাঁকে আর এ সম্বন্ধে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে। বোঝা গেল যে গল্প করে নষ্ট করবার মতো সময় তার হাতে তখন নেই। সে দাঁড়িয়েছিল শুধু একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে। মানুষ যে বদলায় সে কথা আর এম-এল-সাহেবকে বুঝিয়ে দিতে হবে না। আর যিনি চথুরির মুখে গুরুমাহাত্ম্যের বুলি ফোটাতে পারেন, তিনি যে মূককে বাচাল ও পঙ্গুকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘন করাতে পারবেন সে বিষয়ে সন্দেহ কি।

আরও যে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হ'ল, সকলেরই হাবভাব এই একই ধরনের। সকলেই ব্যস্ত। কেউ তাঁকে বিশেষ আমল দিচ্ছে না। নিজের সুখদুঃখের কথা, দেশের অবস্থার কথা, পৃথিবীর রাজনীতির কথা, রকেট, অ্যাটম বোমা, আবহাওয়া, ফসলের অবস্থা—প্রত্যাশিত বিষয়গুলোর উপর কোন কথা কেউ তোলেনি। গালাগাল পর্যন্ত

কেউ দিল না। কারও কি কিছু চাইবার নেই?—ছেলের চাকরি, 'বাস' চালাবার অনুমতিপত্র, রাস্তায় মাটি ফেলবার ঠিকা, সরকারি লোন, সিমেন্ট, বন্দুকের লাইসেন্স, মেয়ের বৃত্তি? 'ইলেকশন'-এর বছরে নির্বাচন প্রার্থীর কাছ থেকে কিছুই চাইবার নেই? ঠিক করে যে যা চাইবে তাকেই সে সম্বন্ধে যথাযোগ্য স্থানে একখানা করে সুপারিশের চিঠি দেবেন, আর আশ্বাস দেবেন প্রাণপণে চেষ্টা করবার। কেউ কিছু চায়নি। তবে কি এরা সবাই বুঝে গিয়েছে যে, তাঁর চিঠিতে সরকারি মহলে কোন ফল হয় না। যাঁদের কাছে তিনি চিঠি দেন তাঁদের সকলের কাছে আগে থেকে বলা আছে যে এসব সুপারিশপত্রের ওপর কোন গুরুত্ব দেবার দরকার নেই। তাঁর এই চালাকি কি এরা ধরে ফেলেছে? লোকে আজকাল চালাক হয়ে উঠছে। সকলে জেনে গিয়েছে যে সরকারি অফিসাররাও আজকাল এম-এল-এ'দের কথায় কোন গুরুত্ব দেয় না। আশকারা পাচ্ছে ওপর থেকে? গত কয় বছরের মধ্যে সত্যিই এখানকার জীবনের স্বাভাবিক মন্থর গতি, আগেকার তুলনায় দ্রুততর হয়েছে। কর্মব্যস্ততা বেড়েছে। এইটুকুই আশার কথা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফল সম্বন্ধে যারা সন্দিগ্ধ তাদের সম্মুখে সুবিধেমত এই দৃষ্টান্তটা তুলে ধরতে হবে, ভোটের মরশুমের বক্তৃতায়।

নিজের জন্মভূমি ও কর্মক্ষেত্রের লোকজনের কাছ থেকে পাওয়া প্রাথমিক অভ্যর্থনা আশানুরূপ না হওয়ায়, একটু ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তিনি অফিসে ফিরে এলেন। নিজের দুশ্চিন্তার কথাটা মুখ ফুটে বলতে বাধে অফিসের কর্মীদের কাছে। না বলতেই বুঝে নিয়েছে, এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লখনলাল আর বচ্‌কন্ মহতো।

'ঘাবড়াবার দরকার নাই ইয়েমিয়েলি সাহাব। সব 'অওল রায়েট' হয়ে যাবে। জলখাবার খাওয়ার সময় সবাই মিলে বসে কেমনভাবে এগুতে হবে তারই একটা প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলতে হবে। আপনি শুধু বার্কারদের (ওয়ার্কার) ওপর বিশ্বাস রাখুন।'

'আর একটা কথা মায়লেজী—আসরে নেমে পয়সা খরচ করতে কার্পণ্য করবেন না। তাহলে আসছে বছর ভূতপূর্ব মায়লে হয়ে যাবেন নির্ঘাত দেখে নেবেন!'

এদের সব কথা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়।

সেকালকার মতো সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি ছোলাভাজা, চিঁড়াভাজা ও পিঁয়াজের বড়ার জলখাবার খেতে বসলেন। আজ তিনি উদার হস্ত; জলখাবারের খরচটা আজ তাঁরই। আরম্ভ হয়ে গেল, খোশগল্পের মধ্যে দিয়ে কাজের কথা।

ভোটার। ভোটার। ভোটার। কেবল ভোটারদের কথা। কটর্ মটর করে ছোলা চিবুবার শব্দ এই গল্পের সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে চলেছে। সাব্যস্ত হয়ে গেল—পাবলিক অবুঝ, জনতা খামখেয়ালী, জনসাধারণ নিমকহারাম। ভোটারদের তালিকায় যাদের নাম

আছে তারা শুধু মানুষ; বাকি সকলে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে আছে অন্যায়ভাবে!

স্ত্রী-ভোটারদের লখনলালজী বলে ভোটারী। এই ভোটারীদের নিয়ে তুমুল মতদ্বৈধ বাধল লখনলাল আর বচ্‌কন্ মহতোর মধ্যে। বোঝা গেল, জনসম্পর্ক বাড়াবার কার্যপ্রণালী স্থির করবার পথেও বাধা প্রচুর।

এম-এল-এ-সাহেবের ধৈর্যের পুঁজি তার চেয়েও বেশি। কথার মোড় ঘোরাবার জন্যে তিনি বললেন—

'মোষের গলার ঘণ্টার এই আওয়াজটা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে।'

বহু বড় বড় আবিষ্কারের সূচনা ঘটেছিল দৈবক্রমে। এখানকার ভোটার ভোটারীদের মনের চাবিকাঠির সন্ধানও পাওয়া গেল এই অবান্তর প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে।

'মোষের গলার ঘণ্টার আওয়াজ? বলছেন কী আপনি! দশ বছর রাজধানীতে থেকে আপনি একেবারে পরদেশী হয়ে গিয়েছেন। এ যে কাঁসার ঘণ্টার শব্দ ভাল করে শুনুন। বুঝতে পারছেন না?'

'হ্যাঁ, এইবার বুঝতে পারছি। আপনাদের চেঁচামেচির মধ্যে আগে এত ভাল করে শুনতে পাইনি। পুজোটুজো আছে নাকি কোথাও?'

'তা জানেন না?'

'এর কথাই তো আপনাকে বলে আসছি তিন বছর থেকে।'

'সকালের আরতি।'

'অষ্টপ্রহর মচ্ছব। সকাল বিকেল নেই এর মধ্যে।'

'প্র্যাকটিশ বেশ জমিয়ে নিয়েছেন স্বামীজী তিন বছরের মধ্যে।'

'যাঁকে দশজনে ভক্তি করে, তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করা ঠিক নয়।'

'ঠাট্টা করছি কই? যাঁর গা দিয়ে ভক্তরা জ্যোতি বার হতে দেখে, তাঁকে নিয়ে আমি ঠাট্টা করতে পারি?'

'তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমাধিস্থ থাকেন, দরজা জানলা বন্ধ করে।'

'আর ওপরের গবাক্ষ দিয়ে ধোঁয়া বার হয়।'

'গোলমেলে ধোঁয়া নয়। নির্দোষ ধোঁয়া। অম্বুরী তামাকের গন্ধওয়ালা ধোঁয়া।'

'ভক্তরা সেই ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নেবার জন্যে বাইরে কাতারে কাতারে বসে থাকে।'

'সুগন্ধি রেচক ও কুম্ভক। যোগ-সাধনার সৌরভ।'

সহকর্মীদের মধ্যে এইসব কথা-কাটাকাটি চলে অনেকক্ষণ। এম-এল-এ সাহেব একটাও কথা বলেননি এর মধ্যে। শুধু শুনছেন ও পরিস্থিতি বোঝবার চেষ্টা করছেন।

সব শুনে মনে হল, এতদিন সহকর্মীরা এখানকার সম্বন্ধে যেসব খবর দিয়েছিল,

সেগুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। জগদ্‌গুরু শ্রীসহস্রানন্দ স্বামী বছর তিনেক থেকে এখানে আশ্রম খুলে বসেছেন। তিনি সিদ্ধ-পুরুষ এবং এখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। এই জন্যেই সকলে উঠতে বসতে 'জয় গুরু' বলে, এই জন্যেই রাজনৈতিক দলের নেতারা এখানে এসে ফুলের মালা পান না; এই জন্যেই খানিক আগে সকলে তাঁর আশ্রমের দিকে ছুটছিল। জিলিপির লোভে ছুটছিল ছেলেপিলেরা, গুরুদেবের দর্শন পাবার লোভে ছুটছিল বয়স্করা। আশ্রমে দুপুরে ধর্মগ্রন্থ পাঠ হয় আর সন্ধ্যেবেলায় হয় কীর্তন। স্বামীজী নিজের সাধন-ভজন নিয়ে থাকেন। তিনি ফল-মূল ছাড়া আর কিছু খান না, এবং টাকা-পয়সা স্পর্শ করেন না। তাঁর নামে সবাই পাগল এবং তাঁর জন্যে প্রাণ দিতে পারেন না এমন লোক এখানে নেই। তিনি ছুঁলে রোগ সেরে যায়। তাঁর বাক্‌সিদ্ধির খ্যাতি অন্য জেলাতেও নাকি পৌঁছেছে। এ ছাড়া সিদ্ধ-পুরুষের অন্যান্য বিভূতিও তাঁর আছে!

এইসব জ্ঞাতব্য তথ্য একত্র করবার পর চরণদাসজী বসলেন সহকর্মীদের সঙ্গে ভোটারদের স্বপক্ষে টানবার কৌশল ঠিক করবার জন্যে। হঠাৎ জমাট আলোচনায় বাধা পড়ল।

'আসুন মৌলবী-সাহেব।'

'আদাব! আদাব ভাইসাহেব!'

এখানে এই প্রথম লোকের সঙ্গে দেখা হল, যিনি 'জয় গুরু' বললেন না। একটু আশ্বস্ত হলেন চরণদাসজী।

বেশ ভারিক্কে গোছের দাড়ি-সম্বলিত, ভারিক্কে প্রকৃতির লোক মৌলবীসাহেব। চাকরি করেন। এখানে বদলি হয়ে এসেছেন কিছুদিন আগে। থাকেন মৌলবী টোলা নামক পাড়ায়। এখন তিনি এখানে এসেছেন, সামান্য একটু কষ্ট দেবার জন্যে পার্টি অফিসের লোকজনদের।

মৌলবী সাহেবের হাবভাব কথাবার্তা বেশ কেতাদুরস্ত! অতি বিনয়ের সঙ্গে জানালেন যে পার্টি অফিসের লোকজনদের সময়ের মূল্য তিনি জানেন। সেই বহুমূল্য সময় নষ্টের হেতু হয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছেন তিনি সরকারি চাকরির কল্যাণে। তিনি এসেছেন সরকারি লোক-গণনার কাজে।

'না না, চিঁড়েভাজা আনবার দরকার নেই। আপনারা খান। সকালে নাস্তা করে তবে আমি বেরিয়েছি বাসা থেকে।'

এখানকার অফিসের স্থায়ী লোকজনের নাম-ধাম তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। বেশ গুছিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে প্রত্যেক ব্যক্তির খুঁটিনাটি বিবরণ লিখে ছাপা 'ফর্ম' গুলো ভরলেন। কাজের শৃঙ্খলা আছে তাঁর।

তারপর এম-এল-এ সাহেবকে অতি নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—'হুজুরের নামও কি এখান থেকেই লেখা হবে?'

অতি নির্দোষ প্রশ্ন, কিন্তু চরণদাস এম-এল-এ-র মনের এক অতি স্পর্শাতুর জায়গায় আঘাত লাগে। সহকর্মীদের সহস্র বিদ্রূপ তিনি সহ্য করতে রাজি আছেন, কিন্তু সরকারি কর্মচারীর ধৃষ্টতা বরদাস্ত করবার পাত্র তিনি নন।

'এখানে লেখা হবে না তো, আবার কোথা থেকে লেখা হবে!'

'আপনি এখন আর এখানে থাকেন না তো; সেইজন্যে জিজ্ঞাসা করলাম হুজুরের কাছে!'

'আমার ঘর-বাড়ি সব এখানে। আমি এখানকার বাসিন্দা নই?'

'আপনার বাড়িটা ভাড়া দিয়েছেন কিনা; তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম কথাটা।'

'বসতবাড়ি ভাড়া দিয়েছি বলে ভোটার তালিকায় নাম থাকবে না আমার?'

'গোস্তাকি মাপ করবেন হুজুর; ভোটার তালিকার সঙ্গে আদমসুমারির কোন সম্বন্ধ নেই।'

'আচ্ছা, যথেষ্ট হয়েছে! আইনচঞ্চুমশাই, এবার থামুন আপনি! সরকারি নিয়ম-কানুন আর শেখাতে হবে না আমাকে, আপনার!'

'তোবা! তোবা! হুজুরকে কানুন শেখাব আমি? আমরা হুকুমের চাকর মাত্র; আপনারাই তো কানুন তৈরি করেন। আপনি যদি এখানকার সুমারির মধ্যে নাম দিতে চান, তবে তাই হবে। যেখানে ইচ্ছে আপনি নাম দিতে পারেন।'

এম-এল-এ সাহেবের মনে একটা ক্ষীণ সন্দেহ জাগে। মৌলবী সাহেবটি তাঁর রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর দলের লোক নয়তো!

'তবে এতক্ষণে এত আইন-কানুন ঝাড়ছিলেন কেন! তিন পয়সা মাইনের চাকরি, আর লম্বা লম্বা কথা।'

'আপনি গণ্যমান্য ব্যক্তি। ভদ্রলোকের ভাষায় কথা বলা উচিত আপনার!

'মুখ সামলে কথা বল বলছি! আমাকে অভদ্র বলা! এখানকার সেন্সাস অফিসার কে? তোমার চাকরি আমি খাব—এই বলে রাখলাম। সরকারি মহলে সে প্রতিপত্তিটুকু আমি রাখি, বুঝলে!'

'সব বুঝেছি; আর বোঝাতে হবে না। এখন বলুন আপনার নাম!'

কলম হাতে নিয়ে 'ফর্ম' সম্মুখে রেখে, উত্তরের প্রতীক্ষা করছেন মৌলবী-সাহেব। এম-এল-এ সাহেব নিরুত্তর, লোকটির ধৃষ্টতা দেখে। তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করছে—যেন জানে না।

'জীবিকা?'

এম-এল-এ নিরুত্তর।

'বিবাহিত না অবিবাহিত?'

উত্তর দিলেন না চরণদাসজী।

'বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নাকি? বৈজ্ঞানিকদের আলাদা কার্ড আছে।'

আর থাকতে পারলেন না চরণদাস এম-এল-এ।

'বেয়াদব লোকদের বৈজ্ঞানিকভাবে মেরে শায়েস্তা করতে আমি বিশেষজ্ঞ।'

আস্তিন গুটিয়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। দলের লোকেরা তাঁকে ধরে ফেলল।

মৌলবী সাহেব ধীর কণ্ঠে উপস্থিত অন্য সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন—'ইনি আমার লোকগণনার কাজ অসম্ভব করে তুলেছেন; অপমান করেছেন; মারধরের হুমকি দেখিয়েছেন; চাকরি যাওয়ার ভয় দেখিয়েছেন। শুধু নামধাম বলতেই অস্বীকার করেননি—একজন সরকারি কর্মচারীকে তাঁর আইন-সঙ্গত সরকারি কাজে বাধা দিয়েছেন। আপনারা সবাই সাক্ষী। আমি আজই এঁর বিরুদ্ধে কোর্টে মোকদ্দমা দায়ের করব।'

'নালিশ দায়ের করবার হুমকি দেখায় জনসাধারণের প্রতিনিধিকে! ছাড় তোমরা, ওকে ঘাড় ধরে বার করে দিচ্ছি এখনই!'

তাঁর আস্ফালনে কান না দিয়ে সহকর্মীরা এম-এল-এ সাহেবকে জাপটে ধরে রেখেছে।

মৌলবী সাহেব ধীরে-সুস্থে নিজের কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে গম্ভীরভাবে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। চোখমুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ব্যঞ্জনা বেশ স্পষ্ট।

এম-এল-এ সাহেবের দাপাদাপি তখনও থামেনি। ঘরের মধ্যে থেকেই তিনি চীৎকার করছেন—'ভেবেছেন আমি আপনাকে চিনিনি। পুলিসে খবর দেবো আমিও!'

লখনলাল বলে—'করছেন কি আপনি ইয়েমিয়েলিয়ে-সাহাব! সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত মেজাজ দেখাচ্ছেন। ভোটার-ভোটারীরা মনে করবে কী!'

দু'-একটা চিন্তার রেখা যেন পড়ল তাঁর কপালে। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর দাপাদাপি সব বন্ধ হয়ে গেল। চাপা গলায় বচ্‌কন্ মহতোর দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন—'ইলেক্‌শানটা একবার হয়ে যেতে দাও। তারপর এই মৌলবীটাকে নাকখত দিইয়ে ছাড়ব।'

তারপর আবার সকলে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে বসলেন ভোটারদের মন পাবার আশু উপায় সম্বন্ধে। আলোচনা যেখানে স্থগিত করা হয়েছিল, ঠিক তারপর থেকে আরম্ভ হল। অর্থাৎ গুরুদেবের প্রসঙ্গ থেকে। সর্বাদিসম্মতভাবে স্থির হয়ে গেল যে 'স্লোগান' পালটাতে হবে। স্বামী সহস্রানন্দকে লক্ষ্য করেই এগোতে হবে অতি সতর্কতার সঙ্গে। ভোটার-চরণদাসকে হতে হবে গুরু-চরণদাস। এইবার স্নানাহারের জন্যে উঠতে হয়। লখনলালজী জয়ধ্বনি দিল—'বলো একবার গুরু-চরণদাসজীকী জয়।'

সব 'অওল রায়েট' হয়ে যাবে—Don't ঘাবড়াও গুরু-চরণদাসজী।'

বিকেলের দিকে এম-এল-এ সাহেব লখনলাল, আর বচ্‌কন্ মহতো, ফলমূল, পেঁড়া, সন্দেশের ভেট নিয়ে খালি গায়ে, খালি পায়ে গিয়ে হাজির জগদ্‌গুরু শ্রীসহস্রানন্দের আশ্রমে।

আজ বোধহয় আশ্রমে কোন এক বিশেষ পর্বের দিন। গেটের দুইপাশে কলাগাছ পোঁতা হয়েছে। সম্মুখের রাস্তা, কম্পাউণ্ড, বারান্দা লোকে-লোকারণ্য। ভক্ত স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা, দর্শক, প্রার্থীর ভিড় ঠেলে ঠেলে ভিতরে ঢোকা শক্ত! কিন্তু আনন্দ উৎসবের দিনের লোকজনের সেই প্রাণবন্ত লীলা-চাঞ্চল্য এখানে অনুপস্থিত। গুরুদেবের সাধন-ভজনের ব্যাঘাত হবে বলে কি এখানে কথাবার্তা বলা বারণ? প্রশ্নভরা চাউনি নিয়ে এম-এল-এ সাহেব তাকালেন নিজের সঙ্গীদের দিকে। লখনলালজীও তাঁরই মত বিস্মিত হয়েছে। তার কাছেও জিনিসটা অপ্রত্যাশিত। অঘটন কিছু ঘটল নাকি? বিষাদের ছায়া? স্বামীজী কি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন? সকলের মুখ-চোখে উৎকণ্ঠার ছাপ কেন? আজকে এখানে আসাই বুঝি ব্যর্থ হল! এখানকার প্রাপ্তবয়স্করা সকলেই যে তাঁর ভোটার। সকলেই তাঁর পরিচিত; তারাও নিশ্চয়ই তাঁকে চেনে; কারও মুখে পরিচিতির সাড়া নাই। কিছু জানবার কৌতূহলটুকুও যেন এরা হারিয়েছে। এ-রকম পীঠস্থানে কারও কাছ থেকে কোন রকম সম্মান পাবার আশা নিয়ে তিনি আসেননি। তবু হেসে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে, নিরুত্তর থেকে শুধু ড্যাবড্যাব করে তাকানো, এ জিনিস তাঁর কল্পনারও বাইরের। সম্মুখের এই ভদ্রলোকের মেজছেলেটা—তাঁর চেষ্টাতেই গত বছর মেডিকেল কলেজে ভরতি হতে পেরেছে। পাশেই এই যে লোকটা মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে, একে দু-বছর আগে তিনি 'কন্ট্রোল'-এর গমের দোকান পাইয়ে দিয়েছিলেন। যারা চোখ বুঁজে, হাত জোড় করে বসে রয়েছে, তারা না হয় দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু এরা তো দেখতে পাচ্ছে তাঁকে। দেখেও না দেখার ভান করছে কেন এরা? লোক চরিয়েই খান তিনি। রাজনীতিক জীবনে বহু লোকের সংস্পর্শে তাঁকে আসতে হয় প্রত্যহ। কেউ হাঁ করবার আগেই তিনি বুঝে যান লোকটা কী বলবে। কিন্তু এখানকার এতগুলো 'ভোটার' 'ভোটারী'র হঠাৎ কী হল, সেইটা বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারছেন না; সবাই মিলে তাঁকে একঘরে করে, তাঁর সঙ্গে কথা বন্ধ করবার পণ করেছে নাকি? বোঝা যাচ্ছে না কিছু। একটা আচমকা আঘাতে এরা সকলে যেন থ হয়ে গিয়েছে। নইলে এরাও তো দেখা যাচ্ছে তাঁরই মত ফল-মূল মিষ্টির থালা সাজিয়ে এনেছিল! কারো কারো হাতে আবার টিফিন-কেরিয়ার! রান্না করা জিনিস নাকি ওর মধ্যে? স্বামীজী তো শুধু ফল-মূল খান! ওগুলো বোধহয় তাহলে তাঁর সঙ্গীদের জন্যে।

অবস্থা প্রতিকূল দেখে পিছপা হবার লোক তিনি নন। চোখ বুঁজে দরাজ গলায় 'জয়

গুরুদেব' বলে চেঁচিয়ে উঠে, সম্মুখের ঘরের বন্ধ দরজার দিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। সমবেত ভক্তবৃন্দ চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল। আচম্বিতে দৈববাণী হলেই এক বোধহয় এখানকার ঝিমিয়ে পড়া পরিবেশ এরকমভাবে হঠাৎ জেগে উঠতে পারত। মূক ভক্তবৃন্দ হঠাৎ যেন তাদের কণ্ঠস্বর আর মনের বল ফিরে পেল। সমবেত কণ্ঠস্বরে গুরুদেবের জয়ধ্বনি আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল। 'ভোটারী'দের মিহিগলা সুর মেলাচ্ছে 'ভোটার'দের মোটা গলার সঙ্গে। জনতার উৎসাহ ও উদ্দীপনার আবেশ-লাগা এই সামূহিক কণ্ঠস্বর, এম-এল-এ সাহেবের অতি পরিচিত।

নিদারুণ সঙ্কটে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভক্তবৃন্দ হঠাৎ একটা আঁকড়ে ধরবার মত ধ্বনির আশ্রয় পেয়ে বর্তে গিয়েছে।

পবন অনুকূল। ভক্তবৃন্দের সশ্রদ্ধ, সপ্রশংস-দৃষ্টি চরণদাসজী অনুভব করতে পারছেন তাঁর সর্বশরীরে। বিমল আনন্দের উদ্ভাস লেগেছে তাঁর মুখমণ্ডলে। এতক্ষণে তিনি চোখ খুললেন। সত্যিই সবাই তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। সে দৃষ্টিতে পরিচিতির আভাস আবার জেগেছে। সকলে যেন এতক্ষণে চিনতে পারল তাঁকে, এখানকার মহামান্য ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব বলে। তাদের গোষ্ঠীরই একজন। গুরু ভাই। আপনার জন। বড় ভাই। ইয়েমিয়েলিয়ে ভাইয়া। এঁর সঙ্গে প্রাণ-খুলে কথা বলা চলে।

চরণদাসজী বললেন—'জয় গুরু!'

মেডিকেল কলেজের ছাত্রটির পিতা 'জয় গুরু' বলে প্রত্যাভিবাদন করে, আরও কাছে ঘেঁষে এলেন তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে।

চরণদাসজীরা প্রোগ্রাম করেছিলেন যে, এখানে এসেই নাটকীয়ভাবে সহস্রানন্দ স্বামীর পা জড়িয়ে ধরবেন। কিন্তু এখানে পৌঁছবার পর, স্বামীজীর ঘরের দরজা বন্ধ দেখে হতাশ হয়েছিলেন। এখন মনের বল ফিরে পেয়েছেন।

ভদ্রলোকটি এম-এল-এ সাহেবকে বললেন—'ফল-মূল মিষ্টিগুলো আপনি ওই সম্মুখের বারান্দায় রেখে দিন। কোনও জিনিস গোলমাল হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সে বিষয়ে।'

'দর্শন পাওয়া যাবে না এখন?'

'সন্দেহ। কথা আছে এর মধ্যে। শোনেননি আপনি এখনও?'

'না তো।'

কন্ট্রোলের দোকানধারী লোকটা এরই মধ্যে কখন যেন তাঁর গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে, তাঁর সঙ্গে একটা কথা বলতে পাবার লোভে।

'মায়ালে-ভাই, বিপদে পড়ে আপনার কথাই আমাদের মনে পড়ছিল এতক্ষণ।'

'আমার কথা? মায়লে আমি ঠিকই; পথের ময়লা; ড্রেনের ময়লা। অতি নগণ্য

মায়লে আমি। আমাকে আপনারা স্মরণ করতে পারেন এতো আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন আদেশ করুন। সামান্য কাঠবেড়ালিও শ্রীরামচন্দ্রজীকে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছিল। এই নগণ্য মায়লেও যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করবে না। ফলাফল গুরুদেবের হাতে। জয় গুরুদেব!'

সকলে বলল, 'জয় গুরুদেব।'

তারপর মায়লে ভাই এঁদের মুখে সব শুনলেন। উৎকট পরিস্থিতি। সমূহ বিপদ। সব বুঝি যায়। ত্রিভুবন রসাতলে গেল বুঝি এইবার! তাঁর দরকার নেই, দরকার আমাদের। নিজেদের প্রয়োজনেই আমরা ভগবানকে আঁকড়ে থাকি। নবরূপ নিয়েছেন বলেই কি আমরা ভগবানকে নিয়ে যা নয় তাই করতে পারি? আমাদের চোখের সম্মুখে ভগবানকে টেনে পাঁকে ফেলা হবে; আর আমরা তাই পুটপুট করে তাকিয়ে দেখবো কেবল? যশ, মান, ধর্ম, কর্ম, ভাল মন্দ সব কিছুরই ভার মায়লে-ভাইয়ের হাতে সঁপে দিয়ে ভেবেছিলাম পাঁচ বছরের জন্যে নিশ্চিন্ত থাকব, কিন্তু আপনি আমাদের মধ্যে থাকতে এখানে এ কী অনর্থ! সংকটে পড়লে আমরা সকলে গুরুদেবের স্মরণ নিতে অভ্যস্ত! একমাত্র সেইখানেই প্রাণ খুলে নিজের সব কথা বলা যায়; বলে বুকের বোঝা হাল্কা করা যায়। তারপর তাঁর আদেশ মত চলে, বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারা যায়। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সে উপায় যে নেই। এ কথা যে তাঁর কাছে তুলতে বাধে। গুরুদেবের কাছে কিছু বলতে বাধা উচিত নয়—তবু বাধে; দুর্বল মানুষ আমরা। অবশ্য তিনি জানতে পারেন সব; হয়ত তিনিই আমাদের দিয়ে এ-কথা আপনাকে বলাচ্ছেন! নিদ্রায় জাগরণে সব সময় যে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে আমাদের ওপর। এই কৃপাটুকু না থাকলে কি আমরা বাঁচি। আপনি তো শুধু এখানকার মায়লে নন, আপনি যে ব্যথার ব্যথী। আপনি যে ভক্ত লোক, সে কথা আর কে জানে না দাদা!'

'আমাকে আর ভক্ত বলে লজ্জা দিও না ভাই। ভক্ত হওয়া কি চাড্ডিখানি কথা। না আছে সে মন, না আছে সে সময়। সাধে কি লোকে আমাদের মায়লে বলে।'

মায়লে-ভাই তারপর সব শুনলেন। এদের বিপদের যথার্থ প্রকৃতিটা বুঝতে একটু সময় লাগল, তাঁর মত বুদ্ধিমান লোকেরও। বোঝবার পর স্তম্ভিত হলেন। এ তো শুধু ভক্তের অনুরোধ নয়; এ যেন 'ভোটার' 'ভোটারী'দের আদেশ! বললেন—'এ তো কারও একার বিপদ নয়? বিপদ যে সমগ্র গোষ্ঠীর! এ বিপদ আমার, আপনার, সকলকার। সমাজের বিপদ; দেশের বিপদ। আমি তো সমাজের বাইরের লোক নই—আমি যে আপনাদেরই একজন। আমি কি চুপ করে বসে থাকতে পারি, এ-কথা আপনাদের মুখে শোনবার পর?'

স্ত্রী-পুরুষ সকলে মায়লে-ভাইয়ের কাছে আসতে চায়, সকলে তাঁর মুখের আশ্বাসবাণী

শুনতে চায়। সকলে এমনভাবে তাঁকে ঘিরে ধরেছে যে নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম।

তিনি আশ্বাস দিলেন—'চেষ্টার ত্রুটি আমি রাখব না। এর জন্যে দিল্লি পর্যন্ত যদি যেতে হয় তা আমি যাব।'

লখনলাল ভরসা দিল—'সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত আমরা লড়ব।'

বচ্‌কন মহতো চেঁচিয়ে বলল—'দরকার হলে অনশন করব আমরা সেন্সাস অফিসারের বাড়ির দোরগোড়ায়। সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করে দেবো সেন্সাস অফিসে। আরও কত কি আমরা করতে পারি। চাই শুধু আপনাদের নৈতিক সমর্থন। আপনাদের চোখে আজ যে আগুন দেখতে পাচ্ছি, সেই আগুন আমরা ছড়িয়ে দেবো সারা দেশে।'

পায়ের ঠোকর মেরে তাকে থামাতে হয়। বক্তৃতা একবার আরম্ভ করলে সে থামতে জানে না।

লখনলাল জয়ধ্বনি দিল—'বোলো একবার শ্রীসহস্রানন্দ স্বামীজীকী জয়।'

বচ্‌কন্ মহতো হাত তুলে লাফিয়ে উঠে ইনকিলাব জিন্দাবাদের ধরনে চেঁচাল—'ঔর ভী একবার বোলো গুরু মহারাজকী জয়!'

লখনলাল বলল, 'এ সম্বন্ধে এখন একটা কাজের প্রোগ্রাম ঠিক করতে হয়?'

বচ্‌কন্ মহতো এ কথায় সায় দিল। 'প্যারে ভাইয়ো আওর বহিনো। আমি প্রস্তাব করছি যে আপনারা সকলে যে যেখানে আছেন বসে পড়ুন। তারপর পাঁচ মিনিট শ্রীগুরুজী ভগবানের ধ্যান করুন, চোখ বুঁজে। আমরা ততক্ষণ একটা প্রাগ্রাম ঠিক করে ফেলি। আপনাদের ধ্যানের একাগ্রতার ওপরই আমাদের প্রোগ্রামের সাফল্য নির্ভর করবে।'

'ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব আর আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি।'

'শান্তি! শান্তি!'

সকলে চোখ বুঁজে বসেছে। সম্মুখের ঘরের বন্ধ দরজা মনে হ'ল যেন ইঞ্চিখানেক ফাঁক হ'ল। ধোঁয়া বার হচ্ছে তার মধ্যে দিয়ে। অম্বুরী তামাকের সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত হয়ে উঠেছে। নিমীলিত চক্ষু ভক্তবৃন্দ আসন্ন সংকট থেকে উদ্ধার পাবার আশ্বাস পাচ্ছে প্রতিবার নিঃশ্বাসের সঙ্গে এই সৌরভ বুকে টেনে নেবার সময়।

ফিস ফিস করে পরামর্শ হচ্ছে নূতন প্রোগ্রাম সম্বন্ধে। পরিস্থিতি বদলেছে সে বিষয়ে কারও মতদ্বৈধ নেই। 'স্লোগান পালটাতে হবে ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব।'

চরণদাসজী বললেন—'গুড় দিয়েই যদি মাছি মরে তবে আর তিত ওষুধ ব্যবহার করবার দরকার কি!'

লখনলাল বলে—'গুরুচরণ দাসজীকে এবার হতে হবে মৌলভীচরণ দাস। এ না করে উপায় নাই।' সর্ববাদিসম্মতভাবে প্রোগ্রাম স্বীকৃত হয়ে গেল। বচ্‌কন্ মহতো

চেঁচাল—'বোলো একবার—'।

পাছে আবার বেফাঁস কিছু বলে ফেলে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি পাদপূরণ করে দিল লখনলাল—'গুরু-চরণ-কমলোঁ কী জয়!'

এই জয়ধ্বনি ভক্তদের ধ্যান ভাঙ্গাবার নোটিস। রেডি! আর দেরি করবার সময় নেই মোটেই! সব 'অওল রায়েট' হয়ে যাবে! শুধু 'বোলো একবার—সহস্রানন্দ স্বামীজী কী জয়!'

অগণিত নরনারীর মিছিল বার হ'ল সহস্রানন্দ স্বামীর আশ্রমের গেট থেকে। সবচেয়ে আগে আগে চলেছেন চরণদাসজী। সকলেই চিন্তাভারাক্রান্ত; শুধু লখনলালজী ও বচ্‌কন্ মাহতো বাদে। তাদের আশ্বাসে কেউ নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। তাই সকলে গুরুদেবের নাম স্মরণ করতে করতে চলেছে। এ সংসারে তাঁর ইচ্ছে ছাড়া কিছু যে হবার উপায় নেই! আর ভরসা, মায়লে ভাইয়া (মায়লেদা)!

মায়লে-ভাইয়া নিজে কিন্তু মোটেই ভরসা পাচ্ছেন না। মৌলবীটোলার কাছে গিয়ে এক গাছতলায় এই নীরব শোক-মিছিলকে থামতে বলল লখনলাল।

'এখান থেকে ইয়েমিয়েলিয়ে সাহাব একাই যাবেন সেই বদ মৌলবীটার বাড়িতে।'

'প্যারে ভাইয়ো ঔর বহিনো! মায়লেজীর উদ্দেশ্য যাতে সফল হয় সেজন্য আসুন আমরা সকলে মিলে ততক্ষণ এই গাছতলায় বসে গুরুদেবের নাম জপ করি। জয় গুরু, জয় গুরু; মায়লেজী আর দেরি করবেন না আপনি।'

বহু রকম বিষয়ের তদ্বির এম-এল-এ সাহেব জীবনে করেছেন। কিন্তু এ বড় কঠিন ঠাঁই। চরণদাসজীর পা কাঁপছে। হাইকম্যাণ্ডের নাম স্মরণ করেও মনে বল পাচ্ছেন না তিনি। মৌলবী সাহেব বাড়ির বারান্দায় গড়গড়া টানছিলেন। দা-কাটা তামাকের গন্ধ অনেক দূর থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

উঠে দাঁড়ালেন মৌলবী সাহেব।

'আসুন, আসুন, এম-এল-সাহেব। সেলামালেকুম্।'

ব্যাপারটা ভালভাবে বোঝাবার আগেই চরণদাসজী গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তাঁর পায়ের উপর। বেশ করে জড়িয়ে ধরেছেন পাজামা সম্বলিত পা দুখানা। 'করেন কি, করেন কি, এম-এল-এ সাহেব!'

তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না—যতক্ষণ না মৌলবী সাহেব কথা দিচ্ছেন যে তাঁর একটা অনুরোধ রাখবেন।

'না না, আপনি আমার গরিবখানায় পদার্পণ করেছেন, তাতেই হয়ে গিয়েছে। সে পুরনো কথা আর তোলবার দরকার নেই। ছাড়ুন! উঠুন উঠুন! এই চেয়ারে বসুন!'

'না, আপনি আগে কথা দেন।'

'বলছি তো। আপনি এসেছেন সেই যথেষ্ট। আর মাপ চাইতে হবে না। রাগের মাথায় লোকে কত সময় কত কি বলে ফেলে। সেসব কথা কি ভদ্রলোক মনের মধ্যে গিঁঠ বেঁধে রাখে চিরকালের জন্য?'

'আপনি কথা দেন, আগে।'

'কেন আমায় লজ্জা দিচ্ছেন বারবার। যা হবার হয়ে গিয়েছে। পা ছাড়ুন।'

কথা আদায় করে চরণদাসজী উঠে দাঁড়ালেন। জানালেন—'এখানকার সকলে আজ অতি বিচলিত। এত বড় বিপদ তাদের জীবনে কখনও আসেনি। এ বিপদ থেকে সকলের উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র আপনি। রাখলে রাখতে পারেন, মারলে মারতে পারেন।'

'আমি?' 'হ্যাঁ, আপনি।'

'খোদা, হাফেজ! বলেন কী!'

সন্দিগ্ধ মৌলবী সাহেব জোর জোর নিশ্বাস টানলেন দুইবার, এম-এল-এ সাহেবের মুখ থেকে কোনরকম গোলমেলে গন্ধ বার হচ্ছে কিনা তাই পরখ করবার জন্য। না পেয়ে উদ্বিগ্ন হলেন আরও বেশি।

'বলছি। বলবো বলেই তো এসেছি। এক কথায় বলবার মত নয় ব্যাপারটা। খোদা আপনার মঙ্গল করবেন। আজ আপনি সামান্য ব্যক্তি নন। এতগুলি লোকের জীবন-মরণ স্বর্গ-নরক নির্ভর করছে আপনার কলমের এক খোঁচার উপর। সবাই আপনার মুখ চেয়ে রয়েছে।'

'বলুন না, কি করতে হবে।'

এতক্ষণে চরণদাসজী আসল কাজের কথাটা পাড়লেন। গলার স্বর কাঁপছে। মৌলবী সাহেবের বিবেকে বাধতে পারে; সেইটাই তাঁর আসল ভয়।

'মৌলবী সাহেব, আজ সকালে আপনি স্বামী সহস্রানন্দের আশ্রমে গিয়েছিলেন লোক গণনার কাজে। সেই সম্বন্ধেই কথাটা। সেখানে আশ্রমের বাসিন্দাদের গোনবার সময় স্বামীজীকেও গুণে ফেলেছেন। আপনার ফাইলে মানুষদের মধ্যে থেকে তাঁর নামটা কেটে দিতে হবে। তিনি তো মানুষ নন, তিনি যে দেবতা, তিনি যে ভগবান।'

মৌলবীসাহেবের অন্যমনস্কভাবে দাড়ি চুলকানো হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।